পঞ্চম অধ্যায়

মতুয়া সম্প্রদায়ের ধর্ম সাহিত্যে ঐতিহাসিক ঘটনা ও সমাজ বাস্তবতা

মতুয়া ধর্ম সম্প্রদায়ের ধর্ম সাহিত্য সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে সর্বপ্রথমেই বলে নেওয়া ভাল যে উনিশ শতকের যে ধর্মসংস্কার আন্দোলন শুরু হয়; সেই সময়ের মানুষ হরিচাঁদ ঠাকুরের জীবনকে এবং ভাবাদর্শকে কেন্দ্র করে যে সাহিত্য সম্ভার রচিত হয় তা 'মতুয়া ধর্ম' সাহিত্য নামে খ্যাত। এই সাহিত্য রচিত হয় হরিচাঁদ ঠাকুরের সমসাময়িক ও হরিচাঁদ ঠাকুরের প্রিয় ভক্ত সহচরের দ্বারা। হরিচাঁদ ঠাকুরের পুত্র গুরুচাঁদ ঠাকুরের জীবন, ও কার্যাবলীকে গ্রন্থ বদ্ধ করেন সমসাময়িক আচার্য মহানন্দ হালদার মহাশয়। মতুয়া ধর্ম সাহিত্যগুলির উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হল এই সাহিত্যে হরিচাঁদ ঠাকুরকে মানুষ ভগবান হিসাবে সাহিত্যকারেরা বা কবিরা একান্ত আপন করে নিয়েছিলেন। আর তাঁর সহযাত্রীরা ছিলেন সকল কর্মের সহযোগী। এই সাহিত্যের ভগবান কোন দূরাগত লোকের অধিবাসী নন। তিনি একান্তই আপনার জন। তিনি সাহিত্যে রচিত কোন কল্পিত মহামানব নন, তিনি হলেন এই বাস্তব জীবন সমাজের প্রতিনিধি। এই বাস্তব সমাজ বা আধুনিক কালের হরিচাঁদ ঠাকুর ও পুত্র গুরুচাঁদ ঠাকুরের জীবন ও ক্রিয়া কর্মগুলিই মতুয়া ধর্ম সাহিত্যের মূল বিষয়বস্তু।

হরিচাঁদ ঠাকুর বাল্যকালেই অলৌকিক শক্তিধর বালক রূপে পরিচিত হন। যৌবনের প্রথমাবস্থায়ই ভক্তের ভগবানে পরিণত হন। হরিচাঁদ ঠাকুর ও শান্তিদেবীর উপর ভক্তির প্রভাব লক্ষ করা যায়। হরিচাঁদ ঠাকুরের চরিত্রে এবং শান্তিদেবীর উপর যে দেবদেবী চরিত্রগুলির প্রভাব বর্ণিত হয় তারা হলেন ভারতের তথা আদি ভারতীয় ঐতিহ্যের প্রতীক চরিত্র 'কৃষ্ণবাসুদেব-বিষ্ণু' শ্রীহরিচাঁদ ঠাকুরের চরিত্রাঙ্কনের মূলে অবস্থান করছে আর শান্তিদেবীর চরিত্রটি অঙ্কিত হয়েছে রুক্মিণী-লক্ষ্মীর অনুসরণে। অর্থাৎ পৌরাণিক চরিত্রের নিরিখে। এই পৌরাণিক চরিত্রগুলির উৎপত্তি সম্পর্কে প্রথমে জেনে নেওয়া প্রয়োজন আলোচনার সুবিধার জন্য। এই পৌরাণিক চরিত্রের সন্ধান করতে গিয়ে দেখা যায় এগুলি পৌরাণিক কাহিনি তান্ত্রিক কাহিনিগুলি, শিব শক্তিবাদ, এছাড়াও আরও অন্যান্য কাহিনিগুলি বৈদিক সভ্যতার

পূর্বেই এদেশে বর্তমান ছিল। শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় তাঁর 'সংস্কৃতি শিল্প ইতিহাস' গ্রন্থের 'ইতিহাস ও সংস্কৃতি' বিষয়ে যে জ্ঞানগর্ভ আলোচনা করেছেন সেখান থেকে পৌরাণিক কাহিনি ও আরও অনেক তথ্য জানার জন্য গ্রহণ করছি। শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় যে বর্ণনা করেছেন সেখান থেকে কিছুটা অংশকে আলোচনার সুবিধার জন্য তুলে ধরলাম—

> 'ইংরেজীতে একটি কথা আছে, The old gods never die—
> পুরাতন দেবতারা চিরকাল জীবিত থাকেন, তাঁহারা মরেন না।
> দেশের বা জাতির প্রাচীন ধর্ম একেবারে নির্মুল হইয়া যায় না—
> নূতন ধর্ম বাহির হইতে আসিয়া গৃহীত হইলেও তাহাতে পুরাতনের
> অনেক জিনিসই একটু নামও রূপ বদলাইয়া নিজ মৌরশী পাট্টা
> কায়েম রাখিয়া থাকে। আর্য্যেরা আসিল তাদের হবন বা হোম
> মূলক ধর্মানুষ্ঠান লইয়া। দেশে, অনার্য্যদের মধ্যে পূজা মূলক
> ধর্মানুষ্ঠান ছিল; 'পূজা' আংশিক ভাবে অথবা ক্ষেত্র বিশেষে
> সংস্কৃত-ভাষাময় অনুষ্ঠান লইয়া আর্য্য-অনার্য্যের মিলিত ধর্মে
> (ব্রাহ্মণ্য ও বৌদ্ধ প্রভৃতি ধর্মে) নিজ স্থান করিয়া লইল। আর্য্যদের
> দেবলোক ও অনার্য্য দ্রাবিড় ও অস্ট্রিকদের দেবলোক, উভয়ের
> মধ্যে একটা সামঞ্জস্য বা মিল দাঁড়াইয়া গেল, আর্য্যানার্য্য অর্থাৎ
> পৌরাণিক দেবলোকের 'সুধর্মা-সভার' অধিবাসীদের সৃষ্টি হইল।
> প্রাচীনের ধারা নবীনের সঙ্গে আপস করিয়া লইয়া পরিবর্তিত
> আকারে কোথাও বা ক্ষীণভাবে কোথাও বা আরও পরিবর্ধিত
> রূপে, এখনও পর্য্যন্ত প্রবাহিত রহিয়াছে।
>
> প্রাচীন অনার্য্য ভাষা, অস্ট্রিক ও দ্রাবিড়, স্বয়ং লুপ্ত হইয়া গিয়াছে,
> কিন্তু এগুলি আর্য্য ভাষার প্রকৃতিকে নানা বিষয়ে পরিবর্তিত
> করিয়া দিয়াছে; এবং প্রচ্ছন্নভাবে খিড়কি দরজা দিয়া বহু অনার্য
> শব্দ আর্য্য ভাষায় স্থান করিয়া লইয়াছে। ..... এখন
> মোটামুটিভাবে আমরা যেন বুঝিতে পারিতেছি যে, বৈদিক
> আর্য্যধর্মের বাহিরে যে পৌরাণিক ও তান্ত্রিক ধর্ম মিলে, যে

> কর্মবাদ, জন্মান্তরবাদ, যোগদর্শন ও যোগের নির্দিষ্ট সাধনা, আদ্যাশক্তির আরাধনা ও শিব-শক্তিবাদ, বিষ্ণুর আরাধনা প্রভৃতি লইয়া হিন্দুধর্মের বৈশিষ্ট্য, সে সমস্ত জিনিস মুখ্যতঃ অনার্য্য-ধর্ম জগৎ হইতেই গৃহীত।[১]

ধর্মসাহিত্যের মধ্যে যে জন্মান্তরবাদের আলোচনা পাওয়া যায় তাও অনার্য্য সভ্যতার পরিচয় বহন করে থাকে। ধর্ম সাহিত্য থেকে দেখা যায় কোন মহামানব কোন বড় কোন কার্য গ্রহণ করেছে তখনই কোন না কোন ভগবানের আবির্ভাব হয়েছে পুনরায় এই ধারণা হয় মানুষের। কারণ সভ্যতার প্রায় প্রথম লগ্ন থেকেই এই বিশ্বাস মানুষের মনে গড়ে উঠেছে। এই জন্মান্তর বাদকেও স্বীকার করা হয় ধর্ম সাহিত্যে। একথা হরিচাঁদ ঠাকুরের লীলা কাহিনি তথা জীবনী গ্রন্থেও বেশ সক্রিয়ভাবে দেখানো হয়েছে। এই যে অলৌকিক শক্তির কথা ব্যক্ত হয় তাও মানুষ বিশ্বাস করে থাকে মহাপুরুষ বা ভগবানের চরিত্র মাহাত্মে। কেননা সেই শক্তিধর পুরুষ সমাজের ব্যক্তি মানুষের শক্তির থেকে অনেক শক্তির অধিকারী হন। আমার গবেষণার বিষয় পূর্ণব্রহ্ম শ্রীশ্রীহরিচাঁদ ঠাকুর ও ও শান্তিদেবীর চরিত্র সেই পূর্ণ বিকশিত সত্ত্বার পরিচায়ক একথা নিঃসন্দেহে বলা যায়। পুত্র গুরুচাঁদ ঠাকুর ও তৎ পত্নী সত্য ভামাদেবীর চরিত্র ও সেই ভগবান চরিত্রের পূর্ণ ক্ষমতার পরিচয় দ্বারাই পরিচিত। এছাড়াও হরিচাঁদ ঠাকুর ও গুরুচাঁদ ঠাকুরের ভাব ধারায় আদর্শিত অনেক মহাসাধক মহাসাধিকার পরিচয় আমরা গ্রহণ করব গ্রন্থ আলোচনার মধ্য দিয়ে। মতুয়া ধর্মের মূল আকরগ্রন্থগুলি থেকে আমরা দেখব উনিশ শতকের সমাজ বাস্তবতার বিভিন্ন দিককে। একটি বিষয় না বললেই নয় কোন ধর্ম প্রণেতার আবির্ভাবে সমাজে বিপুল আলোড়ন সৃষ্টি হয়। আলোড়ন শুধু জ্ঞানের দ্বারা, কর্মের দ্বারাই বিকশিত হয় না। এখানে ভক্তির প্রাবল্যও থাকে গভীরভাবে। তাই সেখানে গানের মাধ্যমেও সেই মহাপুরুষের চরিত্র মাহাত্মকে শ্রদ্ধার্ঘ নিবেদন করেন অনেক ভক্ত সাধকেরা। হরিচাঁদ ঠাকুরকেও এই গানের মাধ্যমে স্তব করেছেন অনেক ভক্তগণ। তাই জীবনী সাহিত্যের সঙ্গে গানের বইও একটি বিশিষ্ট দিকের পরিচয় বহন করে থাকে। হরিচাঁদ ঠাকুরকে কেন্দ্র করে আজ ২০৫ বছরে রচিত হয়েছে অগণিত সাহিত্য সম্ভারের। তার বিভিন্ন দিক রয়েছে।

হরিচাঁদ ঠাকুর ও গুরুচাঁদ ঠাকুরের জীবনের কার্যাবলীর পরিচয় যে সকল গ্রন্থগুলিতে পাওয়া যায় সেই গ্রন্থগুলির মধ্যে ধর্মীয় আবেদন ছাড়া ঐতিহাসিক ঘটনার বিবরণ যেমন

রয়েছে তেমন ভাবে রয়েছে রাষ্ট্রনৈতিক পরিস্থিতির পরিচয়। সমাজের সামগ্রিক পরিচয় কতটা এই জীবনী সাহিত্যে রয়েছে তা আলোচনার বিষয়বস্তু রূপে যেমন এই অধ্যায়ে রয়েছে তেমনি ভাবে মানুষের জীবন কতটা গুরুত্বপূর্ণ তার বিস্তারিত আলোচনা করব। আলোচনার সুবিধার জন্য কয়েকটি পর্বে ভাগ করে নেওয়া হল যথা—

মতুয়া গ্রন্থে ইতিহাসের ঘটনাবলীর পরিচয় সন্ধান।

মতুয়া ধর্ম সাহিত্যে রাজনৈতিক প্রভাব ও গুরুচাঁদ ঠাকুরের ভাবনা।

উপরিউক্ত দিকগুলিকে একটি একটি করে যথাসাধ্য বিস্তারিত আলোচনা করব মতুয়া ধর্ম সাহিত্যগুলির মধ্যে থেকে ঘটনাবলী ও হরিচাঁদ ঠাকুর গুরুচাঁদ ঠাকুরের কার্যাবলী ও তৎকালীন প্রেক্ষাপটের বাস্তব ঘটনার সঙ্গে তুলনা করে। প্রথমেই মতুয়া ধর্ম সাহিত্যের মধ্যে ঐতিহাসিক সত্যের অনুসন্ধান করার চেষ্টা করব।

মতুয়া গ্রন্থে ইতিহাসের ঘটনাবলীর পরিচয় সন্ধান :

মতুয়া ধর্ম সাহিত্যগুলির মধ্যে ঐতিহাসিক সত্যের সন্ধান করতে গিয়ে প্রথমেই বলতে হয় জ্ঞানঅবতার গৌতম বুদ্ধের প্রসঙ্গকে। আচার্য মহানন্দ হালদার 'শ্রীশ্রীগুরুচাঁদ চরিত' গ্রন্থে যথার্থভাবে বৌদ্ধ ধর্মের প্রভাব ও প্রসারের কথা আলোচনা করেছেন। বৌদ্ধধর্ম ছিল বাংলায় রাজধর্ম ও ভেদ জ্ঞানহীন সাম্য নীতির ধর্ম। বাংলার রাজা প্রজা সকলেই এই বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করে কয়েক'শ বছর শাসন কার্য করে চালিয়ে ছিলেন। কিন্তু বৌদ্ধধর্মের পতনের কারণ হয়ে দাঁড়ায় রাজার পরিবর্তনের ফলে। পাল রাজাদের পতনের পর সেন রাজারা তাঁদের রাজত্বকালে মানুষের মধ্য থেকে বৌদ্ধধর্মকে পরিত্যাগ করাতে সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করেন। কিন্তু মহাবলবান বৌদ্ধ সাধকগণ বহু অন্যায় অত্যাচার সহ্য করেও ধর্মকে পরিত্যাগ করেন নি। নিজেরাই নগর ত্যাগ করে গ্রামান্তরে চলে যান ধর্ম রক্ষার জন্য। সেই নির্মম ঐতিহাসিক সত্যের সাক্ষ্য বহন করছে মতুয়া ধর্ম গ্রন্থগুলি।

মহানন্দ হালদারের বর্ণনায় বৌদ্ধধর্মের স্বরূপটি ধরা পড়েছে এভাবে—

''জ্ঞান অবতার বুদ্ধ নব যুগ আনে।

রাজা প্রজা সবে মাতে অহিংসার গানে।

সবে একাকার হল পেয়ে তার শিক্ষা।

আসমুদ্র হিমাচল নিল তার দীক্ষা।।

দেশে দেশে সাম্য নীতি হল পরচার।

মনে হল বিশ্ববাসী হবে একাকার।।''[২]

পাল রাজাদের পরিবর্তনের পর সেন রাজবংশের নৃপতিদের রাজত্বকালে বৌদ্ধ ধর্মকে পরিবর্তন করে ব্রাহ্মণ্য ধর্মের প্রতিষ্ঠা করতে সচেষ্ট হন। অনেকে ব্রাহ্মণ্য ধর্ম গ্রহণ করলেও বৌদ্ধধর্ম পরিত্যাগ করতে অনাগ্রহীদের কীভাবে নির্যাতন করা হয়েছিল তার পরিচয় পাওয়া যায় 'শ্রীশ্রীগুরুচাঁদচরিত' গ্রন্থে ও আরও অনেক গ্রন্থের মধ্যে।

''কত হল অত্যাচার কিবা কব সমাচার।

বৌদ্ধ কত বধ্য ভূমে যায়।

যে ছাড়ে বৌদ্ধের ধর্ম্ম যে হয় পরমধন্য।

রাজদ্বারে সম্মান সে পায়।''[৩]

রাজ আজ্ঞায় শাস্তি নিরুপিত হয় বৌদ্ধ ধর্মের মানুষের। কিন্তু ধর্ম প্রাণ মানুষ সামান্য স্বার্থে ধর্ম ত্যাগ কখনোই করে না প্রমাণ পাওয়া যায় বৌদ্ধ ধর্মের মানুষের কাছে—

''যদি মোরা রাখি ধর্ম্ম মোদের রাখিবে ধর্ম্ম

দেখা যাক কিবা হয় শেষে।।''[৪]

রাজ আজ্ঞানুসারে বৌদ্ধদের মৃত্যুর নির্দেশ দান করেছিলেন তার পরিচয় পাই এভাবে—

'' যেখানে যেখানে বৌদ্ধ পাও কারে নাহি ক্ষমা দেও।

মুণ্ডচ্ছেদ করহ সবার।।''[৫]

এরূপ শাস্তির পরিচয় পাই আমরা সতেন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'বৌদ্ধধর্ম' নামক গ্রন্থে। সেখানে বৌদ্ধ ধর্মে মানুষের উপর কীরকম নির্মম পীড়ন কী অমানবিক কার্যকলাপের মাধ্যমে এই জাতি সংঘর্ষ ও শ্রেণি সংগ্রাম পরিচালিত হয়েছিল তার বিবরণ দিলে আজকের যুগের মানুষ শিউরে উঠবে। একথা জানা যায় বেদ ভাষ্যকার সুবিখ্যাত শায়নাচার্যের ভ্রাতা মাধবাচার্য লিখেছেন—

''কুমারিলের সহায়ভত সুধন্বা রাজা বৌদ্ধ সম্প্রদায় সংহার

উদ্দেশ্যে এই আদেশ প্রচার করেন যে—

আসে তোরা তুষারাদ্রে বৌদ্ধনং বৃদ্ধবালকান্।

ন হন্তি য সহন্ত ব্যে ভৃত্যানিত্য স্বশান্ন্ পঃ।।

অর্থাৎ রাজা স্বকীয় কার্যকর্তাদিগকে আদেশ করিলেন। একদিকে সেতু বন্ধ রামেশ্বর অপরদিকে হিমালয় পর্বত, ইহার মধ্যে আবাল বৃদ্ধ যত বৌদ্ধ আছে, সকলকে সংহার করো। যাহারা বধ না করে তাহারা বধ্য।''[৬]

এহেন অত্যাচারের দ্বারা জোর পূর্বক বৌদ্ধ ধর্মের মানুষদের অনেককে ধর্মান্তরিত করে নিলেও অনেক বৌদ্ধরা ধর্ম ত্যাগ না করে রাজধানী ছেড়ে চলে গিয়েছিলেন রাজ অত্যাচারে তাদের পরিচয় আমরা পরে গ্রহণ করব। ধর্ম ত্যাগ করিয়ে নব ভাবে ধর্ম গ্রন্থ রচনার ইতিহাস ও পাওয়া যায় মতুয়া ধর্ম গ্রন্থের মধ্যে। এই যে নব ব্রাহ্মণ্য ধর্মের প্রতিষ্ঠা করলেন সেই সঙ্গে নতুন শাস্ত্র গ্রন্থও যে রচিত হয়েছিল পুরাণো বৌদ্ধ ধর্ম গ্রন্থগুলিকে পরিবর্তিত করে সেই পরিচয়ও পাওয়া যায়। আচার্য মহানন্দ হালদার শ্রীশ্রীগুরুচাঁদ চরিত গ্রন্থে নব ধর্ম গ্রন্থ রচনার কথা ও পুরোহিত দিয়ে পূজা করার কথা এভাবে বর্ণনা করেছেন—

....

পরে গড়ে অভিনব ধর্ম্ম।

কিছু কিছু বৌদ্ধ নীতি হিন্দু ধর্ম্মে দিল গাঁথি।

কেহ নাহি বুঝিল সে ধর্ম্ম।।

অভিনব পুরাণাদি লিখে সবে নিরবধি

'বেদ ভাস্য' বলি তারে কহে।

সৃজিল দেবতা কত যার যার মনোমত

সবে শ্রেষ্ঠ ক্ষুদ্র কেহ নহে।।

তন্ত্র মন্ত্র উপাখ্যান শাস্ত্র মধ্যে পেল স্থান

ব্রাহ্মণ সাজিল পুরোহিত।।''[৭]

ব্রাহ্মণ পূজার পুরোহিত হলেন। আর বৌদ্ধ ধর্মের শাস্ত্রগুলিও পরিবর্তিত হয়ে হিন্দু শাস্ত্র হল। রাজার পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে ধর্মের পরিবর্তন হয় যেমন তেমনি ধর্ম গ্রন্থেরও ঘটে পরিবর্তন। এর যথার্থ পরিচয় পাওয়া যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর ব্যাখ্যায়। হিন্দু ধর্মের পুনরুত্থান

ও বৌদ্ধধর্মের প্রস্থানের ঠিক সন্ধিক্ষণে বৌদ্ধদের সাহিত্য, ব্যাকরণ, ধর্ম ইত্যাদির পরিবর্তন করে নিজেদের ইচ্ছে মত তৈরি করে নিয়েছিলেন তা হরপ্রসাদ শাস্ত্রী সাহিত্য পরিষদ পত্রিকায় বলেছেন—

> ''বৌদ্ধধর্মের নিদর্শনগুলি ব্রাহ্মণেরা নাম পালটে তাদের নিজস্ব সম্পদ করে নেয়। বৌদ্ধ ধর্মের চিহ্ন পর্যন্ত বাংলাদেশ থেকে নিমূল করে দেয়। বৌদ্ধ সভ্যতার সকল স্মৃতি ব্রাহ্মণেরা লুপ্ত করেছেন। বৌদ্ধ সাহিত্য, ব্যাকরণ, ন্যায়, অলঙ্কার, ধর্ম প্রভৃতি সব কিছুই ব্রাহ্মণেরা পরিবর্তিত করে নিজেদের করে নিয়েছেন।''[৮]

নমঃশূদ্রগণ যে বাংলার একটি বীর জাতি সেই পরিচয় পাওয়া যায় বাংলার রাজা প্রতাপ আদিত্যের রাজত্ব কালেও। নমঃজাতির মানুষ প্রতাপ আদিত্যের সময়ও সামরিক সৈন্য ছিল তার পরিচয় দিয়েছেন আচার্য মহানন্দ হালদার 'শ্রীশ্রীগুরুচাঁদচরিত' গ্রন্থে—

> ''প্রতাপ আদিত্য নাম, মহারাজ পুণ্য ধাম
> তাঁর কীর্ত্তি গাঁথা সব শুনে।
> বাহান্ন হাজার ঢালী নমঃশূদ্র বংশাবলী,
> ব্যাখ্যা তাঁর করে সর্ব্বজনে।।''[৯]

এরপর প্রতাপ আদিত্যের পরাজয়ে অভিশাপ নামে বাঙালির স্বাধীন বাংলায় এবং বীর সৈন্যদের মধ্যে যারা নমঃজাতির মানুষ ছিল তারা সেনা বৃত্তি পরিত্যাগ করে কৃষিকার্যে রত হন। সেই তথ্য দিয়েছেন মহানন্দ হালদার—

> ''তাঁর যত ছিল বীর দুদর্শায় নৃপতির।
> যবনের বশ্যতা মানিল।
> সেনা বৃত্তি ছেড়ে দিয়ে কৃষি আদি কর্ম্ম নিয়ে,
> জীবিকার উপায় করিল।।''[১০]

মতুয়াধর্ম সাহিত্যে ঐতিহাসিক সন্ধানের ফলে জানা যায় যেমন ধর্মের ইতিহাস তেমনি ভাবে বোঝা যায় রাজার পরিবর্তনের পর কীরকম পরিবেশ পরিস্থিতির মধ্যে দিয়ে দিন যাপন করেন পূর্ব রাজার সভাসদগণও ধর্মপ্রাণ প্রজাবর্গ। সেই অনালোকিত ইতিহাসের তথ্য বহন করে চলেছে মতুয়া ধর্ম সাহিত্যগুলি। নমঃজাতির মানুষ সেই রাজ পরিবর্তনের সময় অনেক

ধর্ম প্রাণ মানুষের ধর্ম অপরিবর্তিত ছিল। তাদের নির্মম অত্যাচারিত জীবন চিত্রেরও পরিচয় পাই এই সাহিত্যের মধ্যে। গুরুচাঁদ ঠাকুর নমঃজাতির জাতিতত্ত্ব বর্ণনা করেছেন স্বজাতির সভার মাঝে সেই বক্তৃতা থেকে জানা যায় নমঃশূদ্র জাতির পূর্ব্ব পুরুষের কথা। আর সেই পূর্ব্ব পুরুষের কথার মধ্যেই রয়েছে ঐতিহাসিক সত্য পরিচয়। গুরুচাঁদ ঠাকুর সেই ঐতিহাসিক সত্যকে যেভাবে ব্যক্ত করেছিলেন তা হল—

"যা কিছু বলিতে চাই তাতে মোর কিছু নাই
সব বলে পিতা মোর অগতির গতি।
জাতিতত্ত্ব ইতিবৃত্ত নমঃশূদ্র জাতিতত্ত্ব
স্বজাতি সভার মাঝে বলিবারে চাই।।
পূর্ব্ব পুরুষের কথা তাতে ভরা-পবিত্রতা
বংশ পরিচয় গাঁথা শুনুন সবাই।।"[১১]

গুরুচাঁদ ঠাকুর পিতা শ্রীহরিচাঁদ ঠাকুরের নির্দেশানুসারে সকল কাজ করেছেন সারা জীবন। আর তিনি ছিলেন একজন শিক্ষিত জ্ঞানী মানুষ। তিনি যে যথার্থ জ্ঞানের অধিকারী ছিলেন তার পরিচয় পাই যেমন ধর্ম ক্ষেত্রে তেমনি কর্ম ক্ষেত্রেও সেই অসাধারণ জ্ঞানের পরিচয় রয়েছে। তিনি তৎকালীন শাস্ত্রীয় শিক্ষায় পারদর্শী ছিলেন। আচার্য মহানন্দ হালদার তার সামগ্রিক দিককে যথার্থ ভাবেই তুলে ধরার চেষ্টা করেছেন। আচার্য মহানন্দ হালদারের বর্ণনায় এভাবে ব্যক্ত হয়েছে—

"জগতের তুলাদণ্ডে দেখিতেছি দণ্ডে দণ্ডে
বারে বারে হানা দেয় অসম বিষম।
চিৎ শক্তি ধরি বুকে সম দিতে পৃথিবীকে
নররূপে ভেঙে দেয় যাহা ব্যতিক্রম।"[১২]

এই যে মানুষে মানুষে বিভেদ, সেই নীতিকে অহিংসার অভয় বাণীতে ভরিয়ে তুললেন জ্ঞানী বুদ্ধ। সেই মহান উদারনীতির সুদূর প্রসারী ভাবধারায় রাজা প্রজা সকলেই সমভাবে ব্রতী হয়ে ধর্মাচার পালন করছিলেন সেই তথ্যকে গুরুচাঁদ ঠাকুর সভায় বলেন। সেই বক্তব্যটি হল—

'একদা ভারত খণ্ডে আসিয়া উত্তরবঙ্গে

রাজার আলয় জন্মে জ্ঞান অবতার।

বুদ্ধনামে পরিচিত করিলেন জীবহিত

ভেদাভেদ ভুলি সবে হল একাকার।।

পেয়ে তত্ত্ব এক বর্গ ভূতলে নামিল স্বর্গ

বিশ্বশক্তি মহামন্ত্র উঠিল ধ্বনিয়া।।

....

.....

জীবে শক্তি পায় বুকে ত্রিতাপ জ্বালার মুখে

অহিংসা পরম সত্য জাগিল হৃদয়ে।

নাহি হিংসা নাহি দ্বেষ এক জাতি এক দেশ

দলে দলে বৌদ্ধ ছুটে সে ধর্ম বিজয়ে।।''[১৩]

শুধুমাত্র ধর্ম দ্বারাই যে মানুষের জীবনের উন্নতি সাধন সম্ভব নয় শিল্প সাহিত্যের ও সমভাবে গুরুত্ব পেলে তবেই জীবনে ধর্ম কর্মের সম্মিলনে পূর্ণতা পাওয়া সম্ভব। সেই সকল শিল্প, সাহিত্য যে উন্নত ছিল তার সন্ধান পাওয়া যায়। সারা ভারত বৌদ্ধ ধর্ম প্লাবিত করে বিভিন্ন দেশে দেশে বৌদ্ধ ধর্মের প্রসার ঘটেছিল। কবির বর্ণনায়—

গুরুচাঁদ ঠাকুরের বক্তৃতার বর্ণনা—

''ভারত বিজয় হল তবে ভূভারতে গেল

মানব মনের বাধা গেল যে টুটিয়া

কিবা শিল্প কি সাহিত্য কিবা ধর্ম্ম কিবা তত্ত্ব

শাশ্বত রূপের ছবি উঠিল ফুটিয়া।।''[১৪]

'অনালোকিত অতীত ইতিহাসে ভারতীয় মূল নিবাসীরা ও তাদের ধর্ম ভাবনা' গ্রন্থে লেখক মনিমোহন বৈরাগী বৌদ্ধ পালরাজাদের কীর্ত্তি কথা যথার্থভাবে ব্যক্ত করেছেন। তিনি বলেছেন—

''বাংলার বৌদ্ধ পাল রাজারা ছিলেন জাতিতে নমঃ (চণ্ডাল)।

যাদের রাজত্বকাল ছিল ৭৫০ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১১৩০ খ্রিস্টাব্দ

পর্যন্ত। ..... । চণ্ডাল বংশীয় সম্রাট অশোকের রাজত্বকালের

মত পাল রাজত্ব কালেও সমগ্র ভারতবর্ষই ছিল পাল রাজাদের গৌরবে গৌরবান্বিত। এই সময় পর্যন্ত রাষ্ট্র ব্যবস্থা ছিল সমাজের সকল গোষ্ঠীগুলির সম্মতিতে গঠিত সমানাধিকারের রাষ্ট্র। ধর্ম পাল কর্তৃক মগধে বিক্রম শীলা মহাবিহার এবং বিহারের ওদন্তপুরী বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয় এই সময়েই। এই পাল যুগে নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয় এবং বিক্রমশীলা মহাবিহার সমগ্র পৃথিবীর মধ্যে প্রধান শিক্ষা কেন্দ্রে পরিণত হয়েছিল; যা বৌদ্ধধর্ম ও শিক্ষার ছিল এক অন্যতম পীঠ স্থান।''[১৫]

ব্রাহ্মণ্য ধর্ম কীভাবে রাজধর্ম বৌদ্ধদের অত্যাচার করে ব্রাহ্মণ্য ধর্মে রূপান্তরিত করতে শুরু করেন। অনেকে ব্রাহ্মণ্য ধর্মকে স্বীকার করলেও অনেক বৌদ্ধ ধর্ম বীরগণ ধর্ম রক্ষা করে গহন কান্তারে চলে গিয়েছিলেন তপস্যার জন্য। তারা সকলেই ধর্মবীর হয়ে ধনবান হয়ে জীবন ধারণ করলেও তাদের হীন বলে প্রতিপন্ন করতে অপ ব্যাখ্যা করেন সমাজের আত্ম অহংবোধ সম্পন্ন মানুষ।

''..... ভারতের পূণ্য ভূমে
বৌদ্ধ ধর্ম্ম নাশ করে সবলে পিষিয়া।।
দলে যত ভারী হয় অত্যাচার বেড়ে যায়
ক্রমে ক্রমে বৌদ্ধ নাম গেল দেশান্তরে।
ধর্ম্মে ভালবাসে যারা কতই সহিল তারা
প্রাণ দায় শেষে যায় কানন প্রান্তরে।।''[১৬]

ধর্মের জন্য মহৎ সকলেই সর্ব্বকালে সর্ব যুগে প্রাণ পণ করে ধর্ম রক্ষা করে নিস্বার্থ হয়ে, তারই নিদর্শন পাওয়া যায় ধর্মের নামে অত্যাচারের সময়। সেই ধর্ম রক্ষাকারীর পরিচয় পাই এভাবে—

''ধর্ম্মতরে মাথা দিল মহৎ সকল।।
তার যত বংশধর দূরে থাকি পরস্পর
নিরালে বসিয়া কিছু পালে রীতি নীতি।
ধনবান বলবান করিবারে হত মান

আখ্যা দিল তা সবারে অপবিত্র জাতি।।

....

.....

ভারতের ইতিহাসে বঙ্গ বা অপর দেশে

হিন্দুরূপী বৌদ্ধ দেখা যায় ঘরে ঘরে।।

তাই দেখি সর্ব্বদেশে যা দিগে অস্পৃশ্য ভাষে

হিন্দুর সকল নীতি নাহি জানে তারা।''[১৭]

হিন্দু রাজার অত্যাচারে যে সকল বৌদ্ধ ধর্ম রক্ষাকারী ধর্মবীরগণ বহু লাঞ্ছনার মধ্যে ও রক্ষা করেছে আপন ধর্মাদর্শ সেই মহাধার্মিক পূর্ব্বপুরুষগণই যে নমঃজাতির পূর্ব্ব পুরুষ আর আমরা সেই বংশধরদের উত্তরসূরী একথা জোর দিয়ে বলেছেন গুরুচাঁদ ঠাকুর। এই সত্য ঐতিহাসিক সত্য একথা প্রত্যেক ঐতিহাসিক, সাহিত্য রচয়িতাগণ স্বীকার করেছেন। মহাত্মা গুরুচাঁদ ঠাকুরের সেই বক্তব্যগুলি হল—

''বঙ্গদেশে নিষ্ঠাবান ছিল যত মতিমান

ধর্ম্ম ছাড়ি প্রাণ রক্ষা করিতে না চাহে।

ধর্ম্মতরে দূরে যায় কত অত্যাচার সয়

ধর্ম্মতরে বন মধ্যে হীন হয়ে রহে।।

এই ধর্ম্মবীর যারা সেই বংশে জন্মি মোরা

কালের কুটিল চক্রে হয়ে আছি হীন।

বহুদিন গত হয় সবে মহা দুঃখ সয়

এই ঘরে এল তাই হরিভক্তাধীন।।''[১৮]

এই গুরুচাঁদ ঠাকুরের যে বাস্তব সম্মত ধর্ম জ্ঞান তারও পরিচয় পাওয়া যায় এই পর্বে। ধর্ম পালন করার জন্য যেমন গৃহ ত্যাগের প্রয়োজন নেই তেমনি তীর্থ যাত্রার ও কোন প্রয়োজন নেই। ঘরে বসেই তীর্থপতিকে পাওয়া যায় পবিত্র চরিত্রাদর্শ রক্ষার মাধ্যমে। সেই কথা দৃঢ় করে জানান সকলকে—

''ধর্ম্ম নহে দূরে কোথা ঘর ছেড়ে খোঁজ বৃথা

আপনার ঘরে ধর্ম্ম আছে ঘুমাইয়া।

পবিত্র চরিত্র রেখে সত্য বাক্য বলে মুখে

হরি বলে ধর্ম্ম বাতি লহ জাগাইয়া।।

ঘরে তের দূরে বার ঘরে থেকে ঘর সার।

তীর্থে তীর্থে কিবা কর ফল কিবা তার?

ঘরে আছে কত চোরা তোমাকে করিল সারা

তীর্থে শুধু অর্থ বিত্ত সর্ব্বনাশ হয়।।

ঘরে যদি ঠিক হয় তীর্থ যাবে কিবা দায়

তীর্থপতি জগদিষ্ট রয় তার ঘরে।''[১৯]

এভাবে গুরুচাঁদ ঠাকুর পূর্ব্ব পুরুষের ঐতিহাসিক সত্য উদ্‌ঘাটন করে তাদের অতীত গৌরব গাঁথা স্মরণ করিয়ে তাদের আত্মচৈতন্য দান করে আত্মসম্মান ফিরিয়ে দিয়েছেন। আর সার্ব্বিক মহাসত্যের সন্ধান পাওয়া যায় এই ধর্ম সাহিত্যের মধ্যে। যার ঐতিহাসিক গুরুত্ব সর্ব্বজন স্বীকৃত।

মতুয়া ধর্ম সাহিত্যে রাজনৈতিক প্রভাব ও গুরুচাঁদ ঠাকুরের ভাবনা :

রাষ্ট্র যে ভাবে শাসিত হচ্ছে সেই সময় তার প্রভাব যে মানব সমাজে পড়বে এটাই স্বাভাবিক। বাংলার রাজনৈতিক পরিবর্তন শুরু হয়েছিল অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে পলাশির যুদ্ধের পর মুসলমান নবাবের কাছ থেকে ইংরেজের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তরের মধ্য দিয়ে। ইংরেজ রাজত্ব কালে নীলকর সাহেবের অত্যাচার, জমিদারী প্রথার মধ্য দিয়ে সাধারণ কৃষকদের অসহায়তা দেখা দিলেও উচ্চ বৃত্ত উচ্চ মধ্যবৃত্ত বাঙালি সমাজ যে ইংরেজ শাসনকে সৌভাগ্যময় মনে করেছিল বিভিন্ন কারণে। বাংলার রাজনৈতিক অবস্থার বর্ণনা করেছেন স্বপন বসু তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ 'বাংলার নবচেতনার ইতিহাস'-এ। সেখানে তিনি উনিশ শতকের সচেতন বাঙালির ইংরেজের প্রতি যে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন তার নানা দিক সম্পর্কে তিনি আলোচনা করেছেন। সেখানে তিনি যে সুবিধাগুলি আলোচনা করেছেন তার কিছুটা অংশ তুলে ধরলাম—

''উনিশ শতকের প্রথমার্ধকে সচেতন বাঙালির ইংরেজের প্রতি বিশ্বাসের যুগ বলতে পারি। উচ্চ বৃত্ত ও মধ্যবৃত্ত হিন্দুরা ইংরেজের প্রতি কৃতজ্ঞ ছিলেন মুসলমান অত্যাচার থেকে তাঁদের মুক্ত করে,

ইংরেজি শিক্ষার মাধ্যমে নতুন চিন্তা জগতে নিয়ে যাবার জন্য। এছাড়া ধন প্রাণের কিছুটা নিরাপত্তা; ব্যবসা বাণিজ্য ও কর্মসূত্রে সম্পদ আহরণের সুযোগের জন্যও তাঁরা ছিলেন ইংরেজের একান্ত অনুগত। জনসাধারণ ইংরেজ শাসনকে ঈশ্বরের আশীর্বাদ বলে গণ্য না করলেও, রামমোহন ও ইয়ং বেঙ্গল দুতরফই এদেশে ইংরেজ আগমনের জন্য ঈশ্বরের কাছে কৃতজ্ঞ।''[২০]

এই হল আত্মসচেতন বাঙালির উন্নতির জন্য রাজ সরকারের প্রতি সচেতন চিন্তার প্রসারের দিক। এই রকম একটি আত্মসচেতন বাঙালি পরিবারের কথা আলোচনা করব যারা নিজ পরিবারের উন্নতির সঙ্গে সমগ্র সমাজের উন্নতির জন্য কাজ করেছেন ইংরেজ সরকারের সহায়তায়। তাদের মধ্যে দু'জন মানুষই অগ্রগণ্য এবং তাদের অনুসারী অগণিত মানুষই এই সময় ছিলেন। তারা হলেন হরিচাঁদ ঠাকুর ও গুরুচাঁদ ঠাকুর ও তখনকার ভক্ত সমাজের উন্নতিই ছিল তাঁদের কাম্য। হরিচাঁদ ঠাকুর ধর্মীয় মানুষ হিসাবেই পরিচিত ছিলেন বলেই তাঁর প্রধান লক্ষ্য ছিল কীভাবে খাঁটি ধর্মের মাধ্যমে সমাজের মানুষের উন্নতি সাধন। হরিচাঁদ ঠাকুর প্রথমে 'নাম' ধর্মের মাধ্যমে মানুষের মনকে উন্নত করতে অগ্রসর হন। তিনি 'নাম' ধর্মের সঙ্গে কর্মের সমন্বয় সাধন করে মানুষকে আদর্শ গৃহী মানুষ হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছেন। 'শ্রীশ্রীগুরুচাঁদ চরিত' গ্রন্থে হরিচাঁদ ঠাকুর ও গুরুচাঁদ ঠাকুরের কর্মাদর্শের ভাবধারাকে বিস্তৃত আলোচনা করছেন আচার্য মহানন্দ হালদার। কিন্তু কয়েকটি ছত্রে তাদের কার্য প্রণালীর তথ্য পরিবেশন করেছেন এভাবে—

''নাম অস্ত্রে করে হরি প্রথম আবাদ।
কৃষক সাজিয়া ভূমি কর্ষে গুরুচাঁদ।।
ধর্ম্ম অস্ত্রে হরিচাঁদ পাপকে কাটিল।
কর্ম্মবলে গুরুচাঁদ পুণ্যকে আনিল।।
পবিত্র চরিত্র বীজ তাহে দিল বুনি।
প্রশস্থ গার্হস্থ্য ধর্ম্ম ফলিল তখনি।।''[২১]

হরিচাঁদ ঠাকুর 'নাম' ধর্ম দ্বারা মানুষকে প্রথমে আত্মচৈতন্য, আত্মজ্ঞানী, আত্মদর্শি করেছেন। চরিত্রাদর্শকে কুসংস্কার মুক্ত করেছেন। গুরুচাঁদ ঠাকুর সেই আত্মতত্ত্ব সম্পন্ন মানুষকে নিয়েই

কর্মাদর্শকে গঠন করেছেন। যাতে মানুষ জীবনের সংকীর্ণ পরিসরের মধ্যেই ধর্মাদর্শ ও কর্মাদর্শের পরিপূর্ণ বিস্তারে মানুষের জীবন পূর্ণতা পায় সেই জন্যই কাজ করেছেন। তাই কবি মহানন্দ হালদার গ্রাম্য উদাহরণের মধ্যে তাদের কার্যাবলীর কথা বলেছেন। 'নাম' অস্ত্রে প্রথম আবাদ করেন হরিচাঁদ ঠাকুর মানুষের মনকে, মানুষের দেহকে। আর সেই প্রথম ফসল ফলানো জমিতেই দ্বিতীয় আবাদ করেন কর্মাদর্শের পূর্ণতা রূপে। হরিচাঁদ ঠাকুর পুত্র গুরুচাঁদ ঠাকুরকে দায়িত্ব দেন আদর্শ সাজে মানুষকে সাজানোর জন্য। গুরুচাঁদ ঠাকুর সময়ের সাথে তাল মিলিয়ে, সামাজিক, রাজনৈতিক পরিবেশ পরিস্থিতিতে নিজেকে সচেতন রেখে সমাজের কল্যাণে কীভাবে তৎকালীন পরিবেশে সার্বিক উন্নতির পথ সুগম করেছেন তারই বিস্তারিত আলোচনা করব। গুরুচাঁদ ঠাকুরের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক ভাবনাকে ও কার্যাবলীকে মতুয়া গ্রন্থ থেকে আলোচনা করব। হরিচাঁদ ঠাকুরের কার্যাবলীকে সুদৃঢ়ভাবে অগ্রসর করান গুরুচাঁদ ঠাকুর। তাই তিনি সামাজিক, রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক উন্নতি বিধানের জন্য শিক্ষাবিস্তারের অগ্রাধিকারের উপরই বেশি গুরুত্ব আরোপ করেছিলেন। সামাজিক উন্নতি যেমন নির্ভর করে অর্থনৈতিক উন্নতির উপর, তেমনি আবার অর্থনৈতিক উন্নতিও নির্ভর করে শিক্ষা ও রাজনীতির অগ্রগতির উপর। কারণ শিক্ষা মানুষের বলিষ্ঠ চিন্তাভাবনার জন্ম দেয়, রাজনৈতিক ক্ষমতা আনে বলিষ্ঠ চিন্তার বাস্তব রূপের প্রসারতা। তাই গুরুচাঁদ ঠাকুর রাজনৈতিক পরিবেশের সঙ্গে পরিচিত হয়েছেন। তৎকালীন সরকারের সহযোগিতায় শিক্ষার প্রসারের জন্য শিক্ষায়তনের গঠন ও শিক্ষিত যুবকদের সরকারী কার্যে নিয়োগ করেছেন। যা ছিল এক বিরল দৃষ্টান্ত।

১৯১০ সালের ৫ই ফেব্রুয়ারী একটি ঘটনাকে তুলে ধরছি। গুরুচাঁদ ঠাকুর কীভাবে তৎকালীন শাসকগণের সঙ্গে পরিচিত হয়ে দেশ ও জাতির উন্নতি সাধন করেছেন তারই সাক্ষর বহন করছে। এছাড়াও রয়েছে আরও বহু ঘটনা যাকে ক্রমে ক্রমে আলোচনা করব।

তৎকালীন বিভাগীয় কমিশনার ছিলেন স্যামুয়েল ন্যাথান সাহেব। যিনি ঢাকা বিভাগের কার্যাধ্যক্ষ। তিনি ঠাকুরের জন্মভিটা ওড়াকান্দি পরিদর্শন করেন ন্যাথান সাহেবের কাছে খবর ছিল নমঃজাতির। খবরের যথাযোগ্য পরিচয় গ্রহণ করে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য তৈরি হন। কারণ কমিশনার অফিসে খবর ছিল নমঃ হল একটা দাঙ্গাবাজ জাত। গুরুচাঁদ ঠাকুর কমিশনারের উদ্দেশ্য বুঝতে পেরে ড. মীড সাহেবকে ডাকলেন ও সব কথা বলেন।

ড. মীড সহায়তা করেন গুরুচাঁদ ঠাকুরকে। তিনি যে ন্যাথান সাহেবের অভ্যর্থনার ব্যবস্থা করার কথা বলেন তাতে মীড সম্মতি জানান সপত্নীসহ।

গুরুচাঁদ ঠাকুর যে ভাবে ন্যাথান সাহেবকে অভ্যর্থনা জানান তা থেকে দেশীয় হৃদয়বত্তার পরিচয় মেলে। 'শ্রীশ্রীহরি গুরুচাঁদ চরিত্র সুধায়' বিচরণ পাগল বর্ণনা করেছেন সুন্দর ভাবে। গুরুচাঁদ ঠাকুরের সাহেবকে বরণ করেছেন যে নিয়ম রীতিতে তা হল—

''শ্রীধামেতে উপনীত ক্রমে সর্ব্বজন।
ঠাকুরের ধর্ম্ম কন্যা মিসটাক যিনি।
অগ্রভাগে ঠাকুরের পদ বন্দে তিনি।
হেরিয়ে কমিশনার ঠাকুরে নমিল।
সঙ্গে সঙ্গে গুরুচাঁদ নমস্কার দিল।''[২২]

গুরুচাঁদ ঠাকুর নিজে উদ্দ্যোগী হন সাহেবকে সম্মান জানাতে। ন্যাথান সাহেব রাজচিত সম্মানের যোগ্য ব্যক্তি হলেও তৎকালীন সামাজিক অর্থনৈতিক পরিবেশের কথা ব্যক্ত করেছেন ও সম্মান দান করেছেন দেশাচার মতে। গুরুচাঁদ ঠাকুর নিজেই অতিথিকে বরণ করেন এভাবে—

''বাহাদুরে বসালেন ধরি স্বহস্তেতে।
যার যে সম্মান রক্ষা করে হর্ষচিতে।।
রাজ নীতি ব্যবহার আনন্দে করিল।
পুণ বলে অদ্য মম সুপ্রভাত হল।।
গৃহে বসি হল মম রাজ দরশন।
বড়ই সৌভাগ্য মম সার্থক জীবন।।
.....
কি দিয়ে রাখিব আমি সম্মান রাজার।।
হীরা, মণি মানিক্যাদি যোগ্য এ সম্মানে।
অন্যান্য রাজন্য বর্গ যথাযোগ্য দানে।''[২৩]

তিনি যে ভাবে অভ্যর্থনা দান করেন সাহেবকে তাতে কৃষিজীবী পরিবারের জীবন চিত্র যেমন ফুটে উঠেছে তেমনি ভক্তি ভাবের প্রকাশ ও ঘটেছে। গুরুচাঁদ ঠাকুরের বিনয়াবণত বচনে সাহেব প্রীত হন। তার পরিচয় পাই পরবর্তী কার্যের মাধ্যমে। গুরুচাঁদ ঠাকুর যা বলে বরণ

করেন—

''আমাদের কিছু নাই করিতে কল্যাণ।
আইলেতে দূর্ব্বা হয় ক্ষেতে হয় ধান।।
আমরা গরীব প্রজা আছি আপনার।
কৃপা করি নিন এই ক্ষুদ্র উপহার।।
এত যদি বলিলেন প্রভু দয়াময়।
নত শিরে বাহাদুর এগুয়ে দাঁড়ায়।
মহাপ্রভু ধান্য দূর্ব্বা করিলেন দান।
নেহারিয়ে সবাকার চমকিত প্রাণ।।''[২৪]

দেশের কথা ও দেশিয় পরিস্থিতির অবস্থার বর্ণনা করেন গুরুচাঁদ ঠাকুর বর্ণনা করেন স্যামুয়েল ন্যাথান সাহেবের কাছে। সেকথা এভাবে ব্যক্ত করেন বিচরণ পাগল—

''দেশের মঙ্গল হেতু বলে দয়া ময়।
সব কথা বুঝিলেন সেই মহোদয়।।
মৃদু ভাসে কহে কথা সে কমিশনার।
বিশ্ববন্ধু আপনি হে বুঝিলাম সার।।
বুঝিয়েছি আপনার মঙ্গল সাধন।
আপনার স্বীয় বাঞ্ছা হউক পুরণ।।''[২৫]

হরিচাঁদ ঠাকুর ও গুরুচাঁদ ঠাকুরের আজ্ঞাধিন মানুষ কখনোই আইন বিরুদ্ধ কোন কাজ করেন নি। একথা নাথান সাহেব বোঝেন এবং তিনি গুরুচাঁদ ঠাকুরের সামাজিক, রাজনৈতিক উন্নতির প্রধান সহযোগী হন পরবর্তী কালে। উন্নতির জন্য গুরুচাঁদ ঠাকুরের দাবিকে মেনে নিয়েছিলেন সেই তথ্য মনিমোহন বৈরাগী তাঁর গ্রন্থে দিয়েছেন। তিনি যা বলছেন তা হল—

''ন্যাথান মেনে নিয়েছিলেন গুরুচাঁদ ঠাকুরের বলিষ্ঠ দাবিকে।
তাইতো ১৯৩১ সাল নাগাদ ঢাকা ডিভিশনে মূলত নমঃশূদ্র
ছেলে মেয়েদের পঠন-পাঠনের নিমিত্ত গুরুচাঁদ ঠাকুরের নেতৃত্বে
১০৬৭ টি বিশেষ বিদ্যালয় গড়া সম্ভব হয়েছিল।''[২৬]

গুরুচাঁদ ঠাকুরের শিক্ষার প্রস্তাব ন্যাথান সাহেব গ্রহণ করে বলেছিলেন তিনি সরকারী ভাবে

সহযোগীতা করবেন। গুরুচাঁদ ঠাকুরের সঙ্গে মীড সাহেবকে সহযোগী হয়ে কাজ করতে বলেন কমিশনার। তার পরিচয় পাই 'শ্রীশ্রীগুরুচাঁদচরিত' গ্রন্থে। সাহেবের কর্ম কথাকে এভাবে ব্যক্ত করেছেন মহানন্দ হালদার—

''সাহেব বলিল ইহা উত্তম প্রস্তাব।
হাই স্কুল হলে যাবে শিক্ষার অভাব।।
চেষ্টা করি মীড তুমি হাই স্কুল করো।
তুমি চেষ্টা করিলে করিতে ইহা পারো।।
আমি বলি স্কুল যদি হয় এই খানে।
সরকারী দান দিব অতি অল্প দিনে।।
ঠাকুরের সহযোগে কর এই কাজ।
স্কুল পেলে উচ্চ হবে পতিত সমাজ।।''[২৭]

গুরুচাঁদ ঠাকুরের কাছে ন্যাথান সাহেবের উপস্থিতির সময় বৃহৎ ভক্ত সমাজ ছিল তারা সকলেই ছিল গুরুচাঁদ ঠাকুরের ভক্ত। তাদেরকে নিজেই সাহেবকে দেখিয়ে বলেন, এরা সকলেই নমঃজাতির মানুষ। সাহেবের সামনেই স্কুলের প্রস্তাব করার কথা জানান আর সেই সঙ্গে সকলে বলে—

''সবে বলে দিব টাকা আর দিব ছেলে।''[২৮]

এভাবে স্বজাতির উন্নতির পথ সুগম করেন গুরুচাঁদ ঠাকুর। খ্রীষ্টান মিশনারীর সঙ্গে গুরুচাঁদ ঠাকুর সৌহাদ্য পূর্ণ ব্যবহারের মাধ্যমে তাকে আপন করে নেন ও সর্ব্বদাই মীড সাহেবের সঙ্গে আলোচনা করতেন জাতির উন্নতির জন্য। মীড মহাশয় জাতির উন্নতির জন্য সর্ব্বদা রত থাকতেন গুরুচাঁদ ঠাকুরের সঙ্গে। মীড জাতির উন্নতির সোপান হিসাবে বলেন পত্রিকা প্রকাশ করতে যাতে জাতির পূর্বপুরুষের কথাও উন্নত চিন্তার কথা সকলের কাছে পৌঁছে যায়। এভাবে পরিচিত হতে হবে সকল মানুষের কাছে। গুরুচাঁদ চরিত গ্রন্থে পত্রিকা প্রকাশের কথা জানা যায়—ড. মীড যা বলেন—

''আপনার জাতি পক্ষে যত কথা আছে।
পত্রিকা মুদ্রিত করি দেহ সবা কাছে।।
এই ভাবে এত জাতির হবে পরিচয়।

পত্রিকার দ্বারা কার্য্য বহুবিধ হয়।।

সুসভ্য সমাজ যত আছে পৃথিবীতে।

সংবাদ পত্রিকা লেখে নিজ নিজ মতে।।

অবশ্য পত্রিকা তুমি করহে প্রকাশ।

বহু উপকার হবে কর এ বিশ্বাস।।''[২৯]

জাতিগত বিদ্বেষ যে সভ্যতার উন্নতির প্রধান বিঘ্নতার পরিচয় পাওয়া যায় ড. মীডের উক্তিতে। ভারতে জনগোষ্ঠী যে বিভিন্ন ভাগে বিভক্ত সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু এক জনগোষ্ঠীর মানুষ অন্য জনগোষ্ঠীর প্রতি ঘৃণা করে সেই ঘৃণ্য মনোভাব থেকেই অপর জাতিটি পতিত অর্থাৎ উন্নত জীবন চর্যার সুযোগ থেকে বঞ্চিত করে রাখার ফলে মানুষের জীবনাদর্শ ব্যবহৃত হয় সেই কথাই ড. মীড বলেছেন। ড. মীডের সেই উক্তিটি হল—

''মীড বলে বড় কর্ত্তা শুন দিয়া মন।

কি জন্য তোমার জাতি পতিত এমন।।

এই দেশে উচ্চবর্ণ হিন্দু যত আছে।

শুন সবে কিবা বলে রাজশক্তি কাছে।।

তোমার জাতির কথা বলে ঘৃণা ভরে।।

সেই লাগি রাজশক্তি চেনে না তোমারে।।

এই জন্য কর এবে পত্রিকা প্রচার।

তাহলে তোমার জাতি পাবে উপকার।।''[৩০]

ড. মীডের কথা মত পত্রিকা প্রকাশ করলেন গুরুচাঁদ ঠাকুর। সে পরিচয় পাই মহানন্দ হাল দারের বর্ণনায়—

''ঘরে ঘরে বন্ধ রূপে যেত পত্রখানি।

তাতে নাম 'নমঃশূদ্র সুহৃদ' বাখানি।''[৩১]

গুরুচাঁদ ঠাকুর জমিদারের অত্যাচার থেকেও মুক্তি দেন। ড. মীড গুরুচাঁদ ঠাকুরের সমাজ সংস্কার, সমাজসেবার কাজে সহায়ক হন। বাংলা ১৩২৬ সালের মহাঝড় হওয়ার পর দেশের দুস্থ ও মানুষের পাশে দাঁড়ান গুরুচাঁদ ঠাকুর। সেই সময় অনেক সমাজসেবী সংগঠন ও সমাজসেবায় আত্মনিয়োগ করেন। গুরুচাঁদ ঠাকুরের সমাজসেবার পরিচয় পাই মহানন্দ

হালদারের 'শ্রীশ্রীগুরুচাঁদচরিত' গ্রন্থে। কবির বর্ণনায়—

''গুরুচাঁদ এ সময় দেশের এ দুর্দ্দশায়
গলিলেন করুণায় আপনার মনে!
অন্নহীন দীন গনে ডাকি আনি নিজ স্থানে
অকাতরে অন্ন দেয় প্রতি জনে জনে।।''[৩২]

উনিশ শতকের রাজনীতির যে পরিচয় প্রথম পর্বে পাওয়া যায় সেখানে সাধারণের কোন গুরুত্ব ছিল না অভিজাত বাঙালিরা নিজেদের দাবি দাওয়াকে সরকারের কাছে জানানোর জন্য নিজেরা সংগঠিত হতেন এই সময়। 'বাংলার নবচেতনার ইতিহাস' গ্রন্থে স্বপন বসু উনিশ শতকের রাজনৈতিক দল গঠনের যে পরিচয় দিয়েছেন তা আমার আলোচনার সুবিধার জন্য তুলে ধরলাম। তিনি বলেছেন—

''উনিশ শতকের তৃতীয় দশক থেকে অভিজাত বাঙালিরা নিজেদের বিভিন্ন দাবি-দাওয়া সরকারের কাছে পেশ করার জন্য বিভিন্ন রাজনৈতিক সভা গঠন করে সংগঠিত হতে থাকেন। এই সব সভাগুলিতে জনসাধারণের কোন স্থান ছিল না, বিশেষ বিশেষ গোষ্ঠীই সেগুলির কার্যকলাপ নিয়ন্ত্রণ করতেন।''[৩৩]

এই উনিশ শতকের দুই মহামানব হরিচাঁদ ঠাকুর ও গুরুচাঁদ ঠাকুর মানুষকে ধর্ম কর্মের সম্মিলন করে মানুষকে উন্নত জীবনাদর্শের সন্ধান দেন। গুরুচাঁদ ঠাকুর ও এই সময় সভা গঠন করেন। সভার বিষয় হয় জাতির উন্নতি। শিক্ষার আলোচনা, সরকার চাকরি পাওয়ার জন্য শিক্ষিত যুবকেরা গুরুচাঁদ ঠাকুরের পরামর্শে সরকারের কাছে দরখাস্ত করেন ও সকলে সরকারী চাকরি পায়। গুরুচাঁদ চরিতে তার প্রমাণ রয়েছে—

''চাকুরি না হয় কভু দরখাস্ত বিনা।।
সকলে মীডেরে কহে দিয়াছে দরখাস্ত।
.....
নিজ মনোমত কার্য্য পেল সবজন।।''[৩৪]

অসহযোগ আন্দোলন কালে গুরুচাঁদ ঠাকুর যেভাবে জাতির উন্নতির সাধন করেছিলেন তা থেকে স্পষ্ট ভাবে বোঝা যায় তিনি প্রকৃতপক্ষে মানব দরদি মানুষ। গুরুচাঁদ ঠাকুর ছিলেন

দূরদর্শি জ্ঞান সম্পন্ন, তাঁর পরিচয় পাই তাঁর কর্ম ধারাগুলির মধ্যে। স্বরাজের পক্ষে ছিলেন গুরুচাঁদ ঠাকুর। এদেশের স্বাধীনতা যেমন চাইতেন মনে প্রাণে তেমনি চাইতেন মানুষের মুক্তি। অস্পৃশ্যতা থেকে চিরতরে মুক্তি। তিনি বুঝেছিলেন স্বাধীনতা মানে সমগ্র মানুষের স্বাধীনতা। মুষ্টিমেয় মানুষের স্বাধীনতায় তিনি বিশ্বাসী ছিলেন না। স্বাধীনতার যে মূল্য তা তিনি বুঝতে পেরেছিলেন বলেই অসহযোগ আন্দোলনে তিনি সহমত পোষণ করতে পারেন নি। কেননা ভারতবর্ষের অস্পৃশ্য মানুষের আগে ঘৃণা মুক্ত না হলে স্বাধীনতা হবে কিছু মানুষের মধ্যে সীমাবদ্ধ। তাই গান্ধীজীর অসহযোগ আন্দোলন সম্পর্কে গুরুচাঁদ ঠাকুরের অভিমতটির গুরুত্ব সম্পর্কে অবহিত হওয়া যায়। আর এই অসহযোগে যোগদানের জন্য দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন পত্র দেন ও তাঁকে আহ্বান করেন তিনি যেন সকল ভক্ত মানুষকে নিয়ে আন্দোলনে সামিল হন। এই সময় গুরুচাঁদ ঠাকুর তাঁর বক্তব্যকে জানান বিস্তারিত ভাবে। আলোচনার মাধ্যমে দেখব তৎকালীন পরিবেশ পরিস্থিতিতে কতটা গুরুত্বপূর্ণ গুরুচাঁদ ঠাকুরের বক্তব্য। 'খুলনা কনফারেন্স' সভার মাঝে গুরুচাঁদ ঠাকুর যে ভাবাদর্শের কথা ব্যক্ত করেছিলেন তাতে যেমন ছিল সমাজ বাস্তবতা তেমনি ছিল সামাজিক অবস্থানের পরিচয়। আগে মানুষের উন্নতি প্রয়োজন তারপর ঐক্যবদ্ধভাবে স্বাধীনতা সুখ উপভোগ করার জন্য গুরুচাঁদ ঠাকুর বলেন সভায়। গুরুচাঁদ ঠাকুরের পুত্র শশীভূষণ ঠাকুর 'দেশ' বলতে কি বোঝায় তাই বলেছিলেন স্বদেশী আন্দোলনে যোগদান করতে ইচ্ছুক মতুয়াভক্ত সকলকে। সকলের মঙ্গল সাধনে তৎপর ছিলেন হরিচাঁদ ঠাকুর গুরুচাঁদ ঠাকুর তাই পিতা হিসাবে মান্য করতেন সকলেই গুরুচাঁদ ঠাকুরকে হরিচাঁদ ঠাকুরের প্রয়াণের পর। অম্বিকাচরণের স্বদেশী আন্দোলনের উদ্দেশ্যে যে দলের সভা হয় ঘৃতকান্দিতে সেখানে অনেক মতুয়া ভক্ত বক্তৃতা শোনেন। ভক্ত সকলে বক্তৃতা শোনার পর স্বদেশী আন্দোলনে যোগ দেবেন বলে ঠিক করেন গুরুচাঁদ ঠাকুরের নির্দেশে। সকলে মিলিত হয়ে গুরুচাঁদ ঠাকুরের কাছে আসেন। ঠাকুরের কাছে সকলকে পাঠান দেশ সম্পর্কে জানার জন্য। শশীভূষণ ঠাকুর দেশ সম্পর্কে জ্ঞাত করান ও দেশ জাতির সত্যিকারের পরিচয় জ্ঞাপন করেছেন। আচার্য মহানন্দ হালদার তার শ্রীগুরুচাঁদ চরিত গ্রন্থে যেভাবে বর্ণনা করেছেন তা হল—

''বড় শক্তিশালী বক্তা অম্বিকাচরণ।

বক্তৃতার গুণে করে হৃদয় হরণ।।

.....

বক্তৃতায় মুগ্ধ হয়ে নমঃশূদ্রগণ।

স্বদেশী দলেতে যেতে করিল মনন।।

.....

এ জাতির পিতা তিনি মান্য সবাকার।

একবার অনুমতি লইব তাহার।।

বিশেষ তাঁহার পুত্র শ্রীশশীভূষণ।

এই দেশ মধ্যে তিনি বিদ্যাতে প্রধান।।

তাঁহার মন্ত্রণা মোরা অবশ্য শুনিব।

আজ্ঞা যদি পাই সবে স্বদেশী সাজিব।''[৩৫]

শশীভূষণ ঠাকুর সকলের উদ্দেশ্যে 'দেশ' কথাটির প্রকৃত সত্য জানান এভাবে—

''দেশ নহে মাটি মাত্র 'দেশ' দেশ বাসী।

নরনারী যত সব এক সাথে মিশি।।

নরনারী যদি কভু দুঃখ পেয়ে কান্দে।

'দেশ' কান্দে বলে সবে অতি নিরানন্দে।।

.....

.....

দেশ নহে শুধুমাত্র শিক্ষিত সমাজ।

সেই কথা সবাকারে বুঝাইব আজ।

অশিক্ষিত যারা দেশে তাহারা সংখ্যায়।

শিক্ষিত হইতে বেশি জানিও নিশ্চয়।।

ইহাদের পানে কেহ কভু এত দিন।

চাহে নাই দেখে নাই মনে ভেবে হীন।।

.....

প্রকৃত দেশের প্রাণ বহু দূরে রয়।।''[৩৬]

জাতির উন্নতির জন্য যা প্রয়োজন সেই সকল কথা বলেন এভাবে—

''ধন মান বিদ্যা শিক্ষা সব কিছু লাগে।।
আমরা কৃষক সবে কৃষি কার্য্য করি।
সম্পদের মধ্যে মোরা ভূমি মাত্র ধরি।।
বিলাস ব্যসন মোরা কিছু নাহি চিনি।
কায়ক্লেশে মাটি চিরে ধান্য শস্য আনি।।
' দেশের পরান' বলি যদি কিছু রয়।
কৃষক দেশের প্রাণ জানিবে নিশ্চয়।।''[৩৭]

কেবলমাত্র আন্দোলনে যোগ দিলেই হবে না তার মমার্থ বুঝে কাজ করতে হবে। একথা শশীভূষণ ঠাকুর সকলকে বুঝিয়ে দিয়ে এও বলেছেন এদের আত্মজাগরণ তখনই সম্ভব যখন 'দেশমাতা'কে প্রকৃত সত্যের সঙ্গে জানবে বুঝতে পারবেন। তাই তিনি হরিচাঁদ ঠাকুর ও গুরুচাঁদ ঠাকুরের অভিমতকে সকলের উদ্দেশ্যে বলেছেন—

''আগে বিদ্যা আন ঘরে আন ধন মান।
আচরণে সৎ হও ডাক ভগবান।।
একর্ম্ম করিলে তবে এ জাতি জাগিবে।
'দেশ মাতা' বলে কারে তখন চিনিবে।।''[৩৮]

সকলকে এভাবে শিক্ষা, ব্যবসা, কৃষিকর্ম সব সময় উন্নত চিন্তার মাধ্যমে কর্মের মাধ্যমে বড় হওয়ার প্রেরণা দিয়েছেন। স্বদেশী আন্দোলনে যোগ দিলে তাদের অন্ন চিন্তার বা রোজগারের উপায় না থাকায় গুরুচাঁদ ঠাকুর তাদের বিরত করেন তেমনি জাতির প্রকৃত উন্নতি ঘটতে পারে সমপ্রাণে বসবাস করায় হীন ভাবে ঘৃণা ভরে নয়। গুরুচাঁদ ঠাকুর 'খুলনা কনফারেন্স'র সভায় স্বাধীনতা সম্পর্কে যে ভাষণ দেন তাতে স্পষ্ট ভাবে বোঝা যায় তিনি কতটা দূরদর্শীতার পরিচয় দিয়েছেন। তিনি ছিলেন স্বাধীনতার পূজারী। স্বাধীনতা যে কত বড় মহামূল্যবান জিনিস সে উপলব্ধি গুরুচাঁদ ঠাকুরের ছিল। স্বাধীনতা মানে মানুষে মানুষে সৌভ্রাতৃত্বের বন্ধনে সকলের ঐক্যতা। গুরুচাঁদ ঠাকুর যে একটি মাত্র ব্যক্তি নন। হরিচাঁদ ঠাকুরের সকল ভক্তগণ নিয়েই তার পরিবার। তাই তিনি একাই কোন কাজ করতে পারেন নি সকলকে রেখে। তিনি কোন কাজ করতে গেলে আগে তার সমাজের কথা ভেবেছেন। কেননা তিনি যে পথে চলবেন সেই পথেই চলবে লক্ষ লক্ষ মানুষ যারা হরিচাঁদ ঠাকুরের ভক্ত পরিবার।

তাই তিনি বিচার বিবেচনা করেই কোন সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। গুরুচাঁদ ঠাকুরের ভাবনাগুলির পরিচয় নেব পর্যায়ক্রমে—

''স্বাধীনতা কথা ভাল নে'য়া ভাল দে'য়া ভাল
ভাল তাতে নাহিক সন্দেহ।।''[৩৯]

এই দেশ সেবা দেশ প্রীতির প্রতি অনুরক্ত হয়েও নিজে সক্রিয় ভাবে নিজের কাজ ত্যাগ করে যোগ দিতে পারেন নি। সেই কথা ব্যক্ত হয়েছে। মহানন্দ হালদারের বর্ণনায় ধরা পড়েছে—

''দেশ প্রীতি দেশ সেবা কভু ঘৃণা করে কেবা?
তারতম্য রয়েছে বিধানে।।
স্বাধীনতা যদি আসে তা হতে কি শ্রেষ্ঠ আছে?
বুঝি না যে এত অন্ধ নই।
তবে যে নামিনা পথে, বহু বাধা আছে তাতে
এড়াইতে পারি বাধা কই?''[৪০]

তাই গুরুচাঁদ ঠাকুর নিজেই উদ্দ্যোগী হয়ে হরিচাঁদ ঠাকুরের ভক্তদের ঐক্যবদ্ধভাবে উন্নতির প্রচেষ্টার কথা বলেন। তিনি বলেন—

''জাতির উন্নতি লাগি হও সবে স্বার্থত্যাগী
দিবা রাত্রি চিন্তা কর তাই।
জাতি ধর্ম্ম, জাতি মান জাতি মোর ভগবান
জাতি ছাড়া অন্য চিন্তা নাই।।
কিবা বিদ্যা কিবা ধনে কিবা শিল্পে কি বিজ্ঞানে
রাষ্ট্র নীতি ক্ষেত্রে রাজ কাজে।
সবখানে থাকা চাই তা ভিন্ন উপায় নাই
রাজ বেশে সাজ রাজ সাজে।।
নর নারী দুই জনে প্রতি কার্য্যে প্রতিক্ষণে
তালে তালে হও অগ্রসর।
অলসতা দেও ছেড়ে বল সবে বজ্র স্বরে
'আগে চল নাহি অবসর'।।''[৪১]

গুরুচাঁদ ঠাকুরের প্রখর বাস্তব জ্ঞানের ও দূরদর্শিতার পরিচয় পেয়েছিলেন তথাকথিত জাতীয়তাবাদী নেতা ব্যক্তিগণ। আর তাঁরা এটাও বুঝতে পেরেছিলেন যে গুরুচাঁদ ঠাকুরের সমর্থন পেলে তার অগণিত মানুষ আন্দোলনে যোগদান করলে তাড়াতাড়ি দেশের মঙ্গল স্বাধীনতা হতে পারে। গুরুচাঁদ ঠাকুরকে স্বদেশী আন্দোলনে সামিল হওয়ার জন্য আহ্বান করেন সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাদ্যায়। তার উত্তরে ঠাকুর, বাস্তব সত্যকে তুলে ধরে বলেন সকলকে সমান মর্যাদা দিলে তবেই, এই আন্দোলনে তিনি যাবেন। মানুষে মানুষের যে বৈষম্য তা বলার অপেক্ষা রাখে না। তৎকালীন সমাজে ছিল জমিদারের অত্যাচার, অস্পৃশ্যতার প্রাবল্য। তাই গুরুচাঁদ ঠাকুর সকলকে আগে আত্ম উন্নতির কথা বলেছেন ও তিনি সক্রিয়ভাবে স্বজাতির উন্নতির কাজ করেছেন। এই কর্মময় জীবনের মাঝে আসে বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন ও অসহযোগ আন্দোলন। সেই সময় স্বদেশী হতে ইচ্ছুক হরিচাঁদ ঠাকুরের ভক্তগণকে আন্দোলন থেকে বিরত হতে বলেছেন এই সকল কারণে—

''ওরা যাহা বলে আমি সব তাহা বুঝি।
তথাপি ওদের কার্য্যে নাহি হব রাজি।।
.....
এরা যবে ধনী হবে মানি হবে সবে।
দেশ চিনে দেশ সেবা তখনি করিবে।।
.....
কত অত্যাচার করে জমিদার গণ।
কেহ কি তাহাতে বাধা দিয়াছে কখন?
ছুঁয়োনা ছুঁয়োনা বলে ব্রাহ্মণ কায়স্থ।
কেহ কি করেছে তার হৃদয় প্রশস্ত।।
.....
এই হীন দৃষ্টি দেশে কভু চলিবে না।''[৪২]

গুরুচাঁদ ঠাকুর ১৯০৫ সালে বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের সময় বলেছেন যে আজ যারা পতিত অস্পৃশ্য বলে সকলের কাছে ঘৃণার পাত্র তারাও জাগবেন ও সকল মানব জাতির সঙ্গে ভাই বলে সম্মান পাবেন। এই আশার বার্তা দান করেছেন ভক্তগণকে। হরিচাঁদ ঠাকুর প্রথমে

অস্পৃশ্য বলে কথিত সকলকে ধর্মদান করে স্বাধীনভাবে ধর্ম জীবন পালন করে আত্ম উন্নতির পথ নির্দেশ করেন। আর সেই সকল মানুষই গুরুচাঁদ ঠাকুরেরও প্রিয়জন। তাই গুরুচাঁদ ঠাকুর কখনোই পিতার ভক্তগণকে তাদের কর্ম উন্নতি ছাড়া অন্য পথে যেতে বারণ করেছেন। গুরুচাঁদ ঠাকুরের ভাবনাই তাদের জানিয়ে বলেছেন—

''আজ যারা পদ তলে কাঁদিছে পড়িয়া।
হরিচাঁদ পরশেতে উঠিল জাগিয়া।।
অব্যর্থ অমোঘ শক্তি দিয়াছেন তিনি।
জাগিবে জগতে যত পতিত পরাণী।।
সেদিন নাহিক দূরে বছর পঞ্চাশে।
ভাই ভাই হয়ে সবে রহিবে এদেশে।।''[৪৩]

সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় গুরুচাঁদ ঠাকুরকে পত্র দেন নমঃশূদ্র জাতিকে স্বদেশীতে যোগদানের জন্য। গুরুচাঁদ ঠাকুর সকলকে চুপ করে থাকতে বলেন চিঠির উত্তর না পাওয়া পর্যন্ত। সকলের উদ্দেশ্যে বলেন—

''অপেক্ষা করিয়া রহ সবে এইক্ষণ।
আত্মোন্নতি করি সবে মিলি সর্ব্বজন।।
স্বদেশীর মূল গুরু ব্যানার্জ্জী সুরেন্দ্র।
চারিদিকে ঘুরে সবে তারে করি কেন্দ্র।।
অম্বিকাচরণে জানি শিষ্য বলি তার।
.....
সুরেন্দ্র ব্যানার্জ্জি পত্র দিয়াছেন মোরে।
স্বদেশীতে নমঃশূদ্র মাতাবার তরে।।
ইহার উত্তর আমি দিয়াছি তখন।
আমি বলিয়াছি লেখে শ্রীশশিভূষণ।''[৪৪]

সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়কে গুরুচাঁদ ঠাকুর বলেন তাদের প্রতি উচ্চ বর্ণ মানুষের মনোভাব কীরকম। তারা কখনোই অনুন্নত মানুষদের ভাই বলে সম্মানিত করেন না। গুরুচাঁদ ঠাকুর সমাজ বাস্তবতাকে চিঠিতে তুলে ধরেছেন তাঁর কাছে। তিনি যা বলেছিলেন সেই বক্তব্য

হল—

"নিপীড়িত জাতি যত আছে বঙ্গদেশে।
চিরদিন কাটে দিন দরিদ্রের বেশে।।
রাষ্ট্র ক্ষেত্রে অর্থ ক্ষেত্রে অধিকার নাই।
সব অধিকার নিছে উচ্চবর্ণ ভাই।।
কোন কালে এতদিন উচ্চবর্ণ সবে।
অনুন্নত জনে নাহি দেখে ভ্রাতৃভাবে।।
.....
যদি উচ্চবর্ণ আজি তাহাদের চায়।
এই পথে আছে মাত্র একটি উপায়।।
সরল উদার ভাবে ভাই বলি বুকে।
টানিতে হইবে মনে নহে মুখে মুখে।।
সম্পদ বিপদে সুখ সমভাবে বাঁটি।
ভাই হয়ে ভাই বলে দিতে হবে খাঁটি।।
এই কার্য্য আমি দেখি আগে প্রয়োজন।
নচেৎ হইবে সব ব্যর্থ আন্দোলন।।"[৪৫]

এই পত্র পাওয়ার পর পুনরায় সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় পত্র দিয়ে জানান যে তিনি ওড়াকান্দিতে আসবেন। গুরুচাঁদ ঠাকুর ভবিষ্যতে ঘটনা এই বলে ভক্ত সকলকে বলেন। আর তিনি সকল ভক্তগণকে যা বলেছেন সেই একতার মহামন্ত্রটি হল—

"দীন দুঃখী যত ভাই আছ এক দেশে।
এক ভাবে চল ফেরো থাক একবেশে।।
জয় যদি হয় কিছু হউক সবার।
পরাজয় হলে ভাগ সবে নিব তার।।
.....
এক করিবারে সবে হরিচাঁদ এল।
তাঁরে ভুলে গেলে কিন্তু সকলি বিফল।।

আমাদের ভাই বন্ধু আর কেহ নাই।

ভাই ভাই সব ভাই হরে এক ঠাঁই।।

.....

.....

এক মনে এক প্রাণে চল এক সাথে।

নিশ্চয় জাগিবে জাতি ভুল নাহি তাতে।।''[৪৬]

গুরুচাঁদ ঠাকুর ছিলেন মানবতার প্রতীক। তিনি ধর্মবীর ছিলেন। তাই গুরুচাঁদ ঠাকুরের সমগ্র জীবন ভাবনার মূল কথা ছিল সার্বিক কল্যাণ, সার্বিক উন্নতি। তিনি সমাজ বাস্তবতার পরিপ্রেক্ষিতে হরিচাঁদ ঠাকুরের ভক্তগণকে নিয়ে ঐক্যবদ্ধভাবে সমাজ কল্যাণ করতেন এবং স্বজাতির উন্নতি বিধান করেন ইংরেজ সরকারের সাহায্যে। এছাড়া তিনি যে সর্ব বিষয়ে সর্ব সময় পাশে পেয়েছেন ড. মীড সাহেবকে। তিনি ছিলেন খ্রীষ্ট ধর্মের মানুষ। খ্রীষ্টান মিশানারীর ধর্ম প্রচারক। তিনি ওড়াকান্দিতে বাস করতেন ও গুরুচাঁদ ঠাকুরের সঙ্গে সব সময় মানুষের কল্যাণে সহযোগীতা করতেন। ড. মীডের সঙ্গে ভাল সম্পর্ক থাকার ফলে গুরুচাঁদ ঠাকুরের ইংরেজ কমিশনার, ম্যাজিট্রেট, লাট সাহেব সকলের কাছে গুরুচাঁদ ঠাকুরের পরিচিতি ছিল ধর্মগুরু বড় কর্ত্তা হিসাবে। এবং সকলের মিলিত ভ্রাতৃত্বে জাতির অনেক সাহায্য করেছিলেন। এমনকি দেশীয় মানুষের সঙ্গেও তার মতনৈক্য ঘটলেও তিনি সর্বদাই ধর্ম নীতির সহায়তায় চলতেন। তার নিন্দুকের প্রতি প্রতিহিংসা নীতিতে বিশ্বাসী ছিলেন না তার পরিচয় পাই বিচরণ পাগলের 'শ্রীশ্রীগুরুচাঁদ মাহাত্ম্য' গ্রন্থে। বিচরণ পাগলের বর্ণনায় গুরুচাঁদ ঠাকুরের শিক্ষা নীতির যে আদর্শ পাই তা অতি মূল্যবান সর্ব্বাবস্থায় সর্বকালের মানুষের জন্য। সেই শিক্ষাদর্শকে তুলে ধরলাম। গুরুচাঁদ ঠাকুর যে শিক্ষা ভক্তগণকে দিয়েছেন কবির বর্ণনায় তা হল—

''যদি কেহ করে নিন্দা নাই প্রতিদান।

নিন্দুকেরে ভালবেসো বন্ধুর সমান।।

নিন্দাকে সাবান করি ধৌত কর মন।

আত্মা শুদ্ধি হবে তবে যেন বাছাধন।।

.....

.....

পিতার সম্পদ রক্ষা কর প্রাণ পণে।

না করিও লোভ কভু অপরের ধনে।।

জ্ঞানিন্দ্রিয় কম্মেন্দ্রিয় মনিন্দ্রিয় যত।

সযতনে সবাকারে রেখ বশিভূত।।

না মানিও লোক নিন্দা কর্তব্য পালনে।

আপন কর্তব্য কর পরম যতনে।।

অপরের ছিদ্র নাহি কর অন্বেষণ।

পবিত্র রাখিও সদা দেহ তনু মন।।

তা হইলে আর কভু রবে না ভাবনা।

এক কালে দূরে যাবে ত্রিতাপ যাতনা।।''[৪৭]

সংসার জীবনাদর্শ পালন ছিল হরিচাঁদ ঠাকুরের মূল কথা গুরুচাঁদ ঠাকুর ও সেই আদর্শ শিক্ষাই দিয়েছেন ভক্তগণকে—

''পুত্র কন্যা সযতনে করিও পালন।

সর্বদা করিও সৎ কথা আলাপন।।

হরি কথা বিনে না বলিও অন্য কথা।

অকারণে কারো প্রাণে নাহি দিও ব্যথা।।

পবিত্র স্বভাবী হয়ে কর হরিনাম।

হরিনাম সংকীর্ত্তনে পাইবে আরাম।।

সত্য ভাষী হয়ে কর জীবন যাপন।

তাহলে সফল হবে মানব জীবন।।''[৪৮]

গুরুচাঁদ ঠাকুরের নিত্য ভাবনা ছিল স্বজাতির উন্নতি বিধান করা। তিনিও এই দরিদ্র মানুষের মধ্যে জন্মেছেন তাই সকলের দুঃখের কথা তিনি ভালোভাবেই জানেন। বিচরণ পাগলের বর্ণনায় ফুটে উঠেছে গুরুচাঁদ ঠাকুরের কর্ম প্রণালীর পরিচয়—

''দরিদ্র জাতির মাঝে জনম নিয়েছি।

ভালোভাবে সবাকার দুর্দশা জেনেছি।।

.....

.....

.....

কিভাবে করিব এই জাতির কল্যাণ।''[৪৯]

হরিচাঁদ ঠাকুর ধর্ম ভাবনার মাধ্যমে মনের সংস্কার করেন মানুষের। গুরুচাঁদ ঠাকুর সেই মনের সংস্কারকারী মানুষগুলিকে, কর্ম সংস্কারের মাধ্যমে মানুষের জীবন উন্নত করেন।

১৯১৯ সালের ১লা আগস্ট শুরু হয় মহাত্মা গান্ধীর অসহযোগ আন্দোলন। দেশীয় জিনিস ব্যবহার করতে হবে আর বিদেশী জিনিস বর্জন করতে হবে। গুরুচাঁদ ঠাকুরের মতাদর্শে বিশ্বাসী ভক্ত মানুষেরা কখনোই গুরুচাঁদের নির্দেশ ছাড়া কোনো কাজ করতেন না। তাই তারা অসহযোগ আন্দোলনেও সামিল হন নি। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ, শ্রীবীরেন্দ্র শাসমল, অম্বিকাচরণ, মহাত্মা গান্ধীর সঙ্গে আলোচনা করেন কেন গুরুচাঁদ ঠাকুর ভক্তগণসহ তাদের আহ্বানে সাড়া দেন নি। আন্দোলনে যোগদান করেননি। মাহাত্মা গান্ধীর মতানুসারে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ অসহযোগ আন্দোলন সম্পর্কে আলোচনা করে চিঠি দেন ও আন্দোলনে যোগদানের জন্য আমন্ত্রণ জানান। কবি মহানন্দ হালদার সেই চিঠির বর্ণনা করেছেন এভাবে—

''আপনার গুণকীর্ত্তি বহু শুনিয়াছি।
আপনার গুণ সঙ্গে পরিচিত আছি।।

.....

আলোচনা করিয়াছি গান্ধিজীর সনে।

.....

আপনাকে লিখিতেছি সেই সব ধারা।।
পরাধীন এ ভারতে সবে সহি দুঃখ।
স্বাধীনতা বিনা কভু নাহি হবে সুখ।।
পরাধীন যতেক জাতি আছে ভূমণ্ডলে।
বিদ্যা, বুদ্ধি, ধনে জনে, উন্নত সকলে।।
স্বাধীন হইলে দেশ দুঃখ নাহি রবে।
স্বাধীন ভারতে সবে মহাসুখী হবে।।

অসহযোগের পথে আসিবে সুদিন।

দূরে নহে নিকটেতে সেই শুভদিন।।

অনুন্নত জাতি মধ্যে আপনি প্রবীণ।

শ্রেষ্ঠ নেতা বলি মান্য আছে চিরদিন।।

স্বাধীনতা যজ্ঞে তাই করি আমন্ত্রণ।

জাতি নিয়ে এই পথে আসুন এখন।''[৫০]

পত্র পাওয়ার পর গুরুচাঁদ ঠাকুর তার সামাজিক অবস্থান, সম্পর্কে বাস্তব সত্যের জ্ঞানের সঙ্গে চিঠির উত্তর দিয়েছিলেন তাতে তিনি আন্দোলনে যাওয়ার বাধা যেমন বর্ণনা করেছেন, তেমনি ভাবে তাদের আন্দোলনের বিষয় বস্তুর সঙ্গে মিল ছিল না, সেই দিক আলোচনা করেছেন সেই সঙ্গে অনুন্নত মানুষের সামাজিক বৈষম্য কেমন তাও তুলে ধরেছেন। আর সব শেষে তিনি তাঁর অনুন্নত সমাজকে আন্দোলনে যোগদানের জন্য গ্রহণ করতে হলে ভ্রাতৃভাবের সঙ্গে ভাবের আদান প্রদান হলে তবেই অগ্রসর হবেন। আর ভারতবর্ষ যে পল্লীর দেশ তার সঠিক ব্যাখ্যা দেন চিত্তরঞ্জন দাশ মহাশয়ের কাছে। সেই পত্রটিকে উল্লেখ করলাম—

''প্রভু কয় 'মহাশয়! করি নিবেদন

পত্র যোগে পাইয়াছি তব আমন্ত্রণ।।

আমন্ত্রণ পেলে বটে মান্য দিতে হয়।

কিন্তু বর্তমান ক্ষেত্রে আমি নিরুপায়।।

বহু জীবনের ভার যাবে দেছে বিধি।

অকস্মাৎ কার্য্য তার বড়ই অবিধি।।''[৫১]

তিনি তাঁর সমাজের মানুষের সামাজিক বাস্তব পরিবেশ পরিস্থিতিতে অনুন্নত মানুষদের প্রকৃত অবস্থার বর্ণনা দিয়েছেন চিত্তরঞ্জন দাশকে। গুরুচাঁদ ঠাকুরের অভিমতকে মহাত্মা গান্ধীকে জানাতে বলেন। কবি মহানন্দ হালদারের বর্ণনায় এভাবে ব্যক্ত হয়েছে—

''অবস্থা সকল আমি বলিব খুলিয়া।

দোষ গুণ বলিবেন বিচার করিয়া।।

অনুন্নত বলি যত আছে বঙ্গদেশে।

কোন ভাবে দিন কাটে বেহালের বেশে।।

বিলাসিতা বলি তারা কিছু নাহি জানে।

কোনক্রমে কায় ক্লেশে বাঁচিছে পরাণে।।

বিদ্যা শিক্ষা বেশী কিছু তারা শিখে নাই।

রাজ কার্য্যে অধিকার তাতে নাহি পাই।।

রাজনীতি ক্ষেত্রে তারা কভু নাহি ছোটে।

স্বাধীনতা কি পদার্থ বোঝেনাক মোটে।।

রাজনীতি সঙ্গে যার যোগাযোগ নাই।

অসহযোগের প্রশ্ন তার কিবা ভাই?''[৫২]

প্রকৃত স্বাধীনতার জন্য চাই সামাজিক সাম্য, ভ্রাতৃত্ববোধ, সমাজের মানুষের কোন ভেদ জ্ঞান থাকবে না থাকবে মানব প্রেম। প্রকৃত স্বাধীনতা হল নিজেদের মধ্যে সমস্ত রকম বিভেদ দূরীকরণ করা তবে তো দেশে শান্তির হাওয়া বইবে। তাই গুরুচাঁদ ঠাকুর সমাজের দূর্বলতাকে দূর করে সকলের সম্মিলিত প্রয়াসের দ্বারা স্বাধীনতা আনার পক্ষ পাতি ছিলেন। তিনি বলেছেন—

''সত্য কথা দেশবন্ধু! করি নিবেদন।

.....

সমাজের অঙ্গে আছে যত দূর্ব্বলতা।

আগে তাহা দূর করা আবশ্যক কথা।।

.....

.....

আর এক মহা দুঃখ ইহাদের মনে।

উচ্চ হিন্দু ইহাদিগে 'অস্পৃশ্য' বাখানে।

কি কব দুঃখের কথা তোমার গোচরে।

দেবতারে ভাগ হিন্দু করেছে মন্দিরে।।

অস্পৃশ্য বলিয়া যারা পাইয়াছে আখ্যা।

মন্দিরে ঢুকিলে তার নাহি থাকে রক্ষা।''[৫৩]

গুরুচাঁদ ঠাকুর চিত্তরঞ্জন দাশ মহাশয়কে উদাহরণ স্বরূপ বলেছেন—

''মাতৃ পূজা বেদী তলে সকলে মিশিবে।

যারে দিলে দূরে করে সে কিসে আসিবে?

রাজা করে রাজ সূয় যজ্ঞ আয়োজন।

কাঙ্গালের স্থান সেথা মিলে না কখন।।

রাজা থাকে সিংহাসনে দীন থাকে দূরে।

কোলাকুলি মেশামিলি হবে কি প্রকারে?''[৫৪]

গুরুচাঁদ ঠাকুর চাইতেন প্রকৃত স্বাধীনতা সকলে সমভাবে ভোগ করুক। সমভাবে অসহযোগ আন্দোলনে চলার পক্ষে ছিলেন তিনি। তাই তো সামাজিক অশিক্ষার মুক্তি, অস্পৃশ্যতা মহাপাপ, সেই জ্ঞানালোকের দ্বারা সকলে আলোকিত হলে গড়ে উঠবে সোনার ভারত। তাই তিনি চিঠিতে সেই সম্মিলিত হওয়ার জন্য অনুন্নত জাতির উন্নতি কামনা করেছেন তাঁর কাছে। মহানন্দ হালদার এভাবে বর্ণনা করেছেন—

''এক পথে সকলেরে নিতে যদি মন।

আমার এ বাক্যগুলি করুণ গ্রহণ।।

.....

.....

প্রকৃত দরদ যদি জেগে থাকে মনে।

কূলেতে উঠান সবে হাতে ধরে টেনে।।

'অস্পৃশ্যতা মহাপাপ' করুণ রটনা।

প্রকৃত দরদ দিয়ে জাগান চেতনা।।

শিক্ষা, দীক্ষা অর্থ কিংবা সম্মানাদি দানে।

অনুন্নত জনে দিন সরল পরানে।।

সকলে সরল এরা কুটিলতা নাই।

খাঁটি প্রাণে ইহাদিগে ভাই বলা চাই।।

ভাবিয়া দেখুন মনে দুই কোটী লোক।

.....

.....

মহাত্মা গান্ধীকে তাই জানাই বারতা।

ভাবিয়া দেখেন যেন তিনি মোর কথা।।''[৫৫]

দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশকে গুরুচাঁদ ঠাকুর ভারতের প্রাণকেন্দ্রে যেতে নির্দেশ দেন। কারণ পল্লীনির্ভর দেশ এই আমাদের ভারতবর্ষ। দেশের প্রায় ৮০ শতাংশ লোকের বাসই হল পল্লীগ্রামে। কামার, কুমার, জেলে, তাঁতি, কৃষক, শ্রমিক ইত্যাদি সমাজের বেশিরভাগ মানুষের বসবাসই এই পল্লীগ্রামে। তাই তো অসহযোগ আন্দোলনের সময় পল্লীপ্রাণ কল্যাণকামী গুরুচাঁদ ঠাকুর দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশকে গ্রামে যাওয়ার কথা বলেছিলেন। কবি মহানন্দ হালদার এভাবে বর্ণনা করেছেন গুরুচাঁদ ঠাকুরের মহামূল্যবান ভাবনাকে—

''ভারত পল্লীর দেশ পল্লীতে পরাণ।

শহর ছাড়িয়া সবে পল্লী গ্রামে যান।

পল্লী যদি জাগে তবে জাগিবে ভারত।

অবশ্য সুগম হবে স্বাধীনতা পথ।।''[৫৬]

গুরুচাঁদ ঠাকুরের পত্র পাওয়ার পর ওড়াকান্দিতে যাওয়ার অভিপ্রায় প্রকাশ করেন মহাত্মাগান্ধী দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ মহাশয়ের সঙ্গে। কিন্তু ঘটনাক্রমে তা না হলেও মহাত্মা গান্ধীর সঙ্গে পত্র যোগে যোগাযোগ ছিল গুরুচাঁদ ঠাকুরের। দেশের সামাজিক উন্নতিই ছিল সারাজীবন ধরে কর্মের মূল উদ্দেশ্য গুরুচাঁদ ঠাকুরের আজকের স্বাধীন ভারতের কৃষকের প্রাণের কথা গুরুচাঁদ ঠাকুর বলেছিলেন বহু পূর্বে।

তথ্যসূত্র :

১. চট্টোপাধ্যায়, সুনীতিকুমার, সংস্কৃতি শিল্প ইতিহাস, চতুর্থ প্রকাশ, জিজ্ঞাসা পাবলিকেশন প্রা: লি:, ১৩৩ এ রাসবিহারী অ্যাভিনিউ, কলকাতা-২৯, জানুয়ারি, ২০০৩, পৃ. ২৪-২৫।

২. হালদার, আচার্য মহানন্দ শ্রীশ্রীগুরুচাঁদ চরিত, তৃতীয় সংস্করণ, বীণাপাণি প্রেস, ঠাকুরনগর, নদীয়া, ১৯৯৮, পৃ. ১১১।

৩. পূর্বোক্ত, পৃ. ২৯।

৪. পূর্বোক্ত, পৃ. ৩০।

৫. পূর্বোক্ত, পৃ. ৩০।

৬. ঠাকুর, সত্যেন্দ্রনাথ, বৌদ্ধধর্ম, পৃ. ৫৫-৫৬।

৭. হালদার, আচার্য মহানন্দ শ্রীশ্রীগুরুচাঁদ চরিত, তৃতীয় সংস্করণ, বীণাপাণি প্রেস, ঠাকুরনগর, নদীয়া, ১৯৯৮, পৃ. ২৯।

৮. সাহিত্য পরিষদ পত্রিকা, মে, ১৩৩৬।

৯. হালদার, আচার্য মহানন্দ শ্রীশ্রীগুরুচাঁদ চরিত, তৃতীয় সংস্করণ, বীণাপাণি প্রেস, ঠাকুরনগর, নদীয়া, ১৯৯৮, পৃ. ২৮।

১০. পূর্বোক্ত, পৃ. ২৮।

১১. পূর্বোক্ত, পৃ. ১২২।

১২. পূর্বোক্ত, পৃ. ১২৪।

১৩. পূর্বোক্ত, পৃ. ১২৪।

১৪. পূর্বোক্ত, পৃ. ১২৪।

১৫. বৈরাগী, মনিমোহন, অনালোকিত অতীত ইতিহাসে ভারতীয় মূল নিবাসীরা ও তাদের ধর্ম ভাবনা, তৃতীয় প্রকাশ, ষাঁড়া গড়িয়া লেন, শান্তিপুর, নদীয়া, ১৩ই মার্চ, ২০১৪, পৃ. ১০২-১০৩।

১৬. হালদার, আচার্য মহানন্দ শ্রীশ্রীগুরুচাঁদ চরিত, তৃতীয় সংস্করণ, বীণাপাণি প্রেস, ঠাকুরনগর, নদীয়া, ১৯৯৮, পৃ. ১২৪।

১৭. পূর্বোক্ত, পৃ. ১২৪।

১৮. পূর্বোক্ত, পৃ. ১২৫।

১৯. পূর্বোক্ত, পৃ. ১২৫।

২০. বসু, স্বপন, বাংলায় নবচেতনার ইতিহাস (১৮২৬-১৮৫৬), তৃতীয় সংস্করণ, পুস্তক বিপণি, ২৭ বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা-৯, ২০০০, পৃ. ১৭৯।

২১. হালদার, আচার্য মহানন্দ শ্রীশ্রীগুরুচাঁদ চরিত, তৃতীয় সংস্করণ, বীণাপাণি প্রেস, ঠাকুরনগর, নদীয়া, ১৯৯৮, পৃ. ৪৭।

২২. পাগল, শ্রীমৎ বিচরণ, শ্রীশ্রীহরিগুরুচাঁদ চরিত্র সুধা, প্রকাশক, আমতলী, বরিশাল, ১৩৫১ বঙ্গাব্দ, পৃ. ৭৪।

২৩. পূর্বোক্ত, পৃ. ৭৪।

২৪. পূর্বোক্ত, পৃ. ৭৪।

২৫. পূর্বোক্ত, পৃ. ৭৪।

২৬. বৈরাগী, মনিমোহন, অস্পৃশ্য ও অনগ্রসর জাতির মুক্তি আন্দোলনে হরিগুরুচাঁদ ঠাকুর ও মতুয়া ধর্ম, দ্বিতীয় প্রকাশ, ষাঁড়া গড়িয়া লেন, শান্তিপুর, নদীয়া, ১১ই মার্চ, রবিবার, ২০১২, পৃ. ১৩৫।

২৭. হালদার, আচার্য মহানন্দ শ্রীশ্রীগুরুচাঁদ চরিত, তৃতীয় সংস্করণ, বীণাপাণি প্রেস, ঠাকুরনগর, নদীয়া, ১৯৯৮, পৃ. ২২৭।

২৮. পূর্বোক্ত, পৃ. ২২৭।

২৯. পূর্বোক্ত, পৃ. ২০৪।

৩০. পূর্বোক্ত, পৃ. ২০৫।

৩১. পূর্বোক্ত, পৃ. ২১৯।

৩২. পূর্বোক্ত, পৃ. ৪০৫।

৩৩. বসু, স্বপন, বাংলায় নবচেতনার ইতিহাস (১৮২৬-১৮৫৬), তৃতীয় সংস্করণ, পুস্তক বিপণি, ২৭ বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা-৯, ২০০০, পৃ. ১৯৩।

৩৪. হালদার, আচার্য মহানন্দ শ্রীশ্রীগুরুচাঁদ চরিত, তৃতীয় সংস্করণ, বীণাপাণি প্রেস, ঠাকুরনগর, নদীয়া, ১৯৯৮, পৃ. ২৩০-২৩১।

৩৫. পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৫০।

৩৬. পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৫১।

৩৭. পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৫১।

৩৮. পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৫১।

৩৯. পূর্বোক্ত, পৃ. ৪৪৩।

৪০. পূর্বোক্ত, পৃ. ৪৪২।

৪১. পূর্বোক্ত, পৃ. ৪৪৩।

৪২. পূর্বোক্ত, পৃ. ১৭৪।

৪৩. পূর্বোক্ত, পৃ. ১৭৪।

৪৪. পূর্বোক্ত, পৃ. ১৭৪।

৪৫. পূর্বোক্ত, পৃ. ১৭৫।

৪৬. পূর্বোক্ত, পৃ. ১৭৫।

৪৭. পাগল, শ্রীমৎ বিচরণ, শ্রীশ্রীগুরুচাঁদ মাহাত্ম্য, প্রথম প্রকাশ, আমতলী, বরিশাল, পৃ. ৫৫-৫৬।

৪৮. পূর্বোক্ত, পৃ. ৫৭-৫৮।

৪৯. পূর্বোক্ত, পৃ. ৫৬।

৫০. হালদার, আচার্য মহানন্দ শ্রীশ্রীগুরুচাঁদ চরিত, তৃতীয় সংস্করণ, বীণাপাণি প্রেস, ঠাকুরনগর, নদীয়া, ১৯৯৮, পৃ. ।

৫১. পূর্বোক্ত, পৃ. ৪১৪।

৫২. পূর্বোক্ত, পৃ. ৪১৪।

৫৩. পূর্বোক্ত, পৃ. ৪১৪।

৫৪. পূর্বোক্ত, পৃ. ৪১৫।

৫৫. পূর্বোক্ত, পৃ. ৪১৫।

৫৬. পূর্বোক্ত, পৃ. ৪১৫।